Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ এপ্রিল, ২০২১

৪৪ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১৯ এপ্রিল, ২০২১, সোমবার, ৫ বৈশাখ, ১৪২৮

৫ম দফায় জেলার ভোট শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ এপ্রিল : রাজ্য বিধানসভার ৫ম দফার ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। জেলার খণ্ডঘোষ, বর্ধমান দক্ষিণ, রায়না, জামালপুর, মেমারি, কালনা, মন্তেশ্বর ও বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে এই পর্যায়ে ভোট হয়। দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া এই ৮ কেন্দ্রে ভোট ছিল শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠ। গড়ে ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে। সকাল থেকে ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। ভোট দাতারা নির্ভয়ে এবারে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

বহুদিন পর কালনা ও মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট দিলেন সাধারণ মানুষ। ভোট লুটের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কঠোর পদক্ষেপের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় গণপ্রতিরোধও হয়েছে। ফলে ভোট লুটেরাদের ভোট লুট অভিযান একেবারেই পর্যুদস্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে ৮ কেন্দ্র জুড়েই জোর প্রচার

ভাতারে সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থী নজরুল হক-এর সমর্থনে ১৮ এপ্রিল রবীন্দ্রপল্লী ময়দানে বক্তব্য রাখছেন সূর্যকান্ত মিশ্র।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ এপ্রিল : ২২ এপ্রিল, ষষ্ঠ দফায় জেলার মোট ৮ কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই কেন্দ্রগুলি ভাতার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম ও গলসি। ৮ কেন্দ্রেই প্রচার চলছে জোরকদমে। সংযুক্ত মোর্চার বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনে ইতিমধ্যে আজ ভাতারে জনসভা করেছেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। অন্যদিকে কাঁদরায় কেতুগ্রাম কেন্দ্রের প্রার্থী মিজানুল কবীর-এর সমর্থনে এক জনসভা হয়। জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য মহঃ সেলিম। ভাতার বাজারে রবীন্দ্রপল্লী ময়দানে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সুভাষ মণ্ডল, বক্তব্য রাখেন প্রার্থী নজরুল হক, কংগ্রেস নেতা সুদীপ মজুমদার প্রমুখ।

১৮ এপ্রিল ভাতার বিধানসভার অন্তর্গত কুড়মুন দিঘির পাড়ে এক সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন ছাত্রনেতা শতরূপ ঘোষ। কাঁদরা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন তমাল মাজি। মহঃ সেলিম ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অচিন্ত্য মল্লিক, কংগ্রেস নেতা ফিরদৌস মিঞা, মহিলা নেত্রী সাধনা মল্লিক প্রমুখ।

১৬ এপ্রিল মঙ্গলকোটের কৈচর হাটতলায় শাহজাহান চৌধুরীর সমর্থনে এক জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দুর্যোধন সর। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা বোরসেদ সেখ ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ।

কাঁদরায় সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত প্রার্থী মিজানুল কবীর-এর সমর্থনে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মহঃ সেলিম।

গলসীতে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত-এর সমর্থনে বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় আদিবাসী সমাজ।

পূর্বস্থলীতে ছাত্র-যুবদের প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৬ এপ্রিল : ছাত্র যুবরা যৌথভাবে সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থীর ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন। আজ তারা ভোট প্রচার করলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নিমদহ, পিলা, পাটুলি এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহার সমর্থনে তাঁরা তুলে ধরছেন কর্মসংস্থানের কথা, শিক্ষার কথা, স্বাস্থ্যের কথা, কাটমানি খাওয়ার কথা। বিগত দশ বছরে পড়াশোনা করে কারো চাকরি হয়নি। কিছু শিক্ষকতার চাকরি হলেও তা হয়েছে পয়সার বিনিময়ে। ছাত্র ও যুবদের এই যৌথ প্রচার সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। মন দিয়ে মানুষ তাদের কথা শুনছেন।

আউশ গ্রামের সিপিআই(এম) প্রার্থী চঞ্চল মাজি-র সমর্থনে নিউটাউন মোড়ে গান ও বক্তব্য দিয়ে কয়েকশত সংস্কৃতিপ্রেমী সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারের ঢেউ তুললেন অভিনেতা বাদশা মৈত্র প্রমুখ।

বামফ্রন্টের আবেদন

সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের জেলায় ষষ্ঠ পর্যায়ে ভোট ২২ এপ্রিল। সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকায় ভোটারদের প্রতি আবেদন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। কোনোরকম প্ররোচনাতে পা দেবেন না। শান্তি-সম্প্রীতি- সৌহার্দ্য বজায় থাকুক।

অমল হালদার আহ্বায়ক, বামফ্রন্ট পূর্ব বর্ধমান জেলা

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ— প্রার্থী পৃথা

মাসাধিক কাল যৌথ খামার, যৌথ হেঁসেল, যৌথ পরিশ্রম। অক্লান্তভাবে খেটে গেলেন ছাত্র যুব কৃষক শ্রমিক সহ পার্টি নেতৃত্ব। ছুঁয়ে দেখা গেল বৃদ্ধের হাত, শিশুদের মুখ, কিশোরীর আবেগ, যুবক যুবতীর বেকারত্ব। শুধু নিছক ভোট চাইতে নয় ইশতেহার নিয়ে, মতাদর্শ নিয়ে, রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে পৌঁছাতে পারা গেল বিরাট অংশের মানুষের দ্বারে দ্বারে। অভিজ্ঞতার পোঁটলায় জমা হল নানা হীরে মানিক। আর অকুণ্ঠ ভালোবাসা—প্রতিদিন, কমরেডদের, সমর্থকদের, বিরোধীদের, অরাজনৈতিক মানুষদের, অভিমানী স্বজনদের! সামনাসামনি হোক, বা দূর থেকে হোক। ভরে উঠত মন। ঝাপসা হয়ে যেত চোখ সময় সময়।

আর ভোটের দিন জানকবুল বুথ রক্ষা করলেন প্রতিটি কমরেড, প্রতিটি এজেন্ট। লাল সেলাম সব্বাইকে। ভোর বেলা থেকে রাত পর্যন্ত কার্যত না খেয়ে, না বাথরুম পর্যন্ত গিয়ে ঠায় পাহারা দিয়ে গেলেন বুথ, অনেকে মহিলা, অনেকে যুবক, এমনকি ডায়ালেসিস চলা বয়স্ক কমরেড। আমি শিখলাম এঁদের থেকে কি করে কমিউনিজমের যাপন করতে হয়। মানুষ এবার বর্ধমান দক্ষিণে সাত বছর পর ভোট দিল কার্যত। দেখা যাক কি হয়...

এনজয় দি ব্যাটেল কমরেড! তবেই তো বোঝা যাবে বেঁচে আছি। সামনে লম্বা রাস্তা। আমরা বেঁচে থাকব। আমরা লড়তে থাকব। লাখ লাখ, কোটি কোটি হয়ে লড়তে থাকব। ‘‘বাঁচার মত বাঁচতে /তারা হাতুড়ি কাস্তে...’’

ভণ্ডরাজা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ওহে রাজা, বেশ তোমার মজা।
লুটছো দেশ, ছদ্মবেশে রাজা সাজা,
যোগব্যায়ামে হালকা থাকো,
গায়ে গতরে বেশ,
লুটছো তুমি দেশ।
ওহে রাজা, বর্গি তুমি তফাৎ নেই
পাল্টে পোষাক একই সেই,
গায়ে গতরে বেশ
লুটছো তুমি দেশ।
অবাক করো যখন
দেশমাতার বলো কথা,
নাটক তোমার পড়েই ধরা
যতই চালাক সাজা।
অনেক কিছু বেচে রাজা,
গরিব গুর্বো পাচ্ছে সাজা।
মানুষগুলো জাগবে এবার,
পাতাল প্রবেশ করবে সোজা
বুঝবে তখন কেমন মজা।

নতুন চিঠি

১৯ এপ্রিল, ২০২১

ডবল ইঞ্জিন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রচারে ‘আর নয় অন্যায়’, ‘পরিবর্তনের পরিবর্তন’ এ জাতীয় শ্লোগান ছাড়াও বিজেপি আর একটি চটকদার কথা আমদানি করেছে। কথাটি হল ‘ডবল ইঞ্জিন’। বিজেপি কেন্দ্রে সরকারে আছে, রাজ্যেও বিজেপি সরকার গঠিত হলে দুটো ইঞ্জিনে চলা গাড়ি যেমন দ্রুত চলে, বিকাশের রথও তেমনি দ্রুত ছুটবে এটাই রাজ্যবাসীকে বোঝানো হচ্ছে। যে-কোনো দলের শ্লোগানই যেহেতু শেষ বিচারে এক রাজনৈতিক প্রস্তাব, তাই এই প্রস্তাব কতটা সমর্থনযোগ্য তা যাচাই করার প্রয়োজন আছে।

ভারতরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোটি যুক্তরাষ্ট্রীয়। বিরাট এই দেশের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণে যাতে নষ্ট না হয়, সংবিধান প্রণেতারা তাই সুচিন্তিতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচটি বেছে নিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসনের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে গোটা দেশে সুষম বিকাশই এই ক্ষমতা বিভাজনের মূল কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ খবরদারি করা নয়, রাজ্যগুলির সাথে সমন্বয় সাধন। রাজ্যের দায়িত্ব, কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণ আর যে সমস্ত কেন্দ্রীয় নীতি জনবিরোধী, যেমন সাম্প্রতিককালের তিন কৃষি আইন, তা নিয়ে প্রতিবাদী হওয়া। স্বাধীনতার পর বহুকাল কেন্দ্রের শাসকদলই অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল। কিন্তু তার ফলে কি সারা দেশে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়েছে? নিশ্চয়ই না। বিকাশ সত্যি হয়ে থাকলে আঞ্চলিক দলগুলির সৃষ্টিই হতো না বা তারা ক্ষমতায় আসতে পারত না। কেন্দ্রে ও রাজ্যে এক দলের সরকার থাকা তাই উন্নয়নের পূর্বশর্ত আদৌ নয়। তা কাম্যও নয়, কারণ সেক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্য কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিলে একের পক্ষে অন্যকে সংশোধন করার উপায় থাকে না। ডবল ইঞ্জিন সেক্ষেত্রে ভুলকে ‘ডবল’ বা দ্বিগুণিত করে গাড়িটাকেই বে-লাইন করে দেয়।

আসলে ফ্যাসিবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত দাপুটেরা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চায় না, চায় নিরঙ্কুশ আধিপত্য। ভারতের সংবিধান এদেশের স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের সে ইচ্ছাপূরণের পথে অন্তরায়। তাই সুকৌশলে ‘ডবল ইঞ্জিন’-এর শ্লোগান তোলা হয়েছে। তাছাড়া যেসব রাজ্যে ‘ডবল ইঞ্জিন’ চলছে সেখানে যে জেট গতিতে বিকাশ হচ্ছে এমন কথা কেউ বলবে না। দূরে যেতে হবে না, পাশের রাজ্য ত্রিপুরার উদাহরণ টানা যেতে পারে। উত্তরপূর্বের আটটি রাজ্যের মধ্যে অতিমারি মোকাবিলায় ত্রিপুরার স্থান অষ্টম, অর্থাৎ ডাহা ফেল। স্বাস্থ্যসমেত ২৮টি দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব স্বয়ং দেখেন। এই রাজ্যে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ হয়নি বিগত তিন বছর, এমনকি অতিমারির দুঃসময়েও। রাজ্যে সুস্থতার হার তাই শোচনীয়ভাবে কম—৬৭.৫ শতাংশ। আসলে ‘হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান’ যে এজেণ্ডা নিয়ে বিজেপি চলতে চায়, রাজ্যে অ-বিজেপি সরকার থাকলে তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে বাধ্য। সেই বাধা কাটাতে তাই ডবল ইঞ্জিনের ভাঁওতা আমদানি করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকৃতই করতে চাইলে আঞ্চলিক স্তরে ক্ষমতার দরকার নেই, প্রয়োজন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের সদিচ্ছা। আর দৃষ্টি যদি হয় অতীতমুখী, ভ্যাকসিনের যুগে যদি পড়াতে চাওয়া হয় গো-বিজ্ঞান, তাহলে ডবল ইঞ্জিন লাগলে গাড়ি দ্বিগুণ জোরে ছুটবে বটে তবে সামনের দিকে নয়, পিছন দিকে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? তখন বিধানসভার মোট আসন কত ছিল? কবে বিধানসভা গঠিত হয়? কোন দলের কে মুখ্যমন্ত্রী হন? তিনি কবে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন?

২. পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচন কত সালে হয়? কবে বিধানসভা গঠিত হয়? কোন দলের কে মুখ্যমন্ত্রী হন? তখন বিধানসভার আসন কত ছিল?

৩. পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়? কবে বিধানসভা গঠিত হয়? কোন দলের কে মুখ্যমন্ত্রী হন? তখন বিধানসভার আসন কত ছিল?

৪. পশ্চিমবঙ্গে সপ্তম বিধানসভা নির্বাচন কোন সালে হয়? কবে বিধানসভা গঠিত হয়? কোন দলের কে মুখ্যমন্ত্রী হন? কোন দল এই নির্বাচন বয়কট করে?

৫. পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা নির্বাচন কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়? কত আসন ছিল? বিধানসভা কবে গঠিত হয়? কোন দলের কে মুখ্যমন্ত্রী হন? তিনি কোন সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন?

৬. পশ্চিমবঙ্গে ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচন কত সালে হয়? কবে বিধানসভা গঠিত হয়? কোন দলের কে মুখ্যমন্ত্রী হন? তিনি কোন সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন?

৭. পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচন কোন সালে হয়? কবে বিধানসভা গঠিত হয়? কোন দলের মুখ্যমন্ত্রী কে হন?

৮. পশ্চিমবঙ্গে ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচন কোন সালে হয়? কবে বিধানসভা গঠিত হয়?

৯. পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন কবে থেকে কবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? ফলাফল কবে ঘোষিত হবে?

১০. একের অধিক দুবার কে কে মুখ্যমন্ত্রী হন? কোন কোন সালে?

১১. তিনবার মুখ্যমন্ত্রী কে হন? কোন কোন সালে?

১২. পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী কে হন? কত বছর তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন? কোন কোন সালে মুখ্যমন্ত্রী হন? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

মার্কসবাদ থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

অরিন্দম কোঙার

মার্কসবাদ

আবার ২২ এপ্রিল এসে গেল। ২০২১ সালের ২২ এপ্রিল। শ্রমজীবী মানুষের কাছে বড় স্মরণীয় দিন। মানব সমাজের উন্নতি ঘটাতে এক উজ্জ্বল দিন। ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ, রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরে সিমবিস্ক শহরে, যিনি পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে ‘লেনিন’ নামে সমধিক পরিচিত। মার্কস-এঙ্গেলসের যোগ্য উত্তরসূরি লেনিন।

মানুষ ও তার সমাজের বিকাশের অন্তর্নিহিত কারণ উদ্‌ঘাটন করেন মার্কস (১৮১৮-৮৩) এবং তাঁকে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন এঙ্গেলস (১৮২০-৯৫)। বলা যেতে পারে মার্কস ও এঙ্গেলস পরস্পরের পরিপূরক। শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তির উপায় নির্ধারণ করেন মার্কস। মানবমুক্তির মতবাদ হচ্ছে মার্কসবাদ। মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে হয় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে তার পরিবর্তন ঘটাতে হয় যাতে মার্কসবাদ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। লেনিন প্রথম সার্থকভাবে এই কাজটাই করেন। ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসে ‘মার্কসবাদ’-কে ‘লেনিনবাদ’ অভিহিত করা হয়। তাই আজকের ‘মার্কসবাদ’ হচ্ছে ‘মার্কসবাদ-লেনিনবাদ’। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়কের মতে, ‘‘মার্কসের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা লেনিনের মতবাদ মার্কসীয় ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই অগ্রগতি ঘটাতে গিয়ে তিনি আবশ্যিকভাবে মার্কসের নির্বাচিত কিছু রচনাকে এর ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মার্কসের চিন্তার যে অগ্রগতি লেনিনের দ্বারা সম্পন্ন হলো তার মধ্যে মার্কসের সামগ্রিক রচনার স্পষ্ট বিভাজনের একটি প্রক্রিয়া নিহিত আছে—তা হলো একদিকে মার্কসের চিন্তার মৌল বা কেন্দ্রীয় অংশ—যা গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে, এই কেন্দ্রীয় অংশের চারপাশে গড়ে ওঠা অতিরিক্ত গঠন বা নির্মাণ যা প্রয়োজনসাপেক্ষে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই দ্বিবিভাজনের প্রক্রিয়ার তাৎপর্য হচ্ছে সমস্ত ধরনের মার্কসীয় তত্ত্ব পুনর্গঠনের প্রয়াস যা লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ গ্রন্থে তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।’’ লেনিনের ‘সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর’ বইটার ভারতে ২০০০ সালে লেফট ওয়ার্ড বুক্‌স প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এই কথাগুলো লেখেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

উনিশ শতকে শ্রমজীবী মানুষ পায় মুক্তির মতবাদ, মার্কসবাদ। আর মানুষ সেই মুক্তির স্বাদ পায় ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র। শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ। তবে একের পর এক বাধা পেরিয়ে। কখনও দেশের বাইরে থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্মিলিত আক্রমণ, কখনও দেশের ভেতর থেকে প্রতি-বিপ্লবী শক্তির নাশকতা। তার উপর অত্যন্ত পশ্চাদপদ দেশ রাশিয়া, দুর্বল অর্থনীতি। এই সব প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করতে হয়। তাই কখনও যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ (ওয়ার কমিউনিজম) (১৯১৮), কখনও নয়া অর্থনৈতিক নীতি (নিউ ইকনমিক পলিসি) (১৯২১) গ্রহণ করতে হয়। তারপর তো ১৯২৯ সাল থেকে শুরু হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। লেনিনের অবশ্য তখন মৃত্যু হয়েছে।

১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি মস্কোর কাছে গর্কি গ্রামে লেনিনের মৃত্যু হয়। শবদেহ মস্কোয় আনা হয় ২৩ জানুয়ারি। ২৭ জানুয়ারি ক্রেমলিনের কাছে রেড স্কোয়ারে স্মৃতিসৌধে তাঁর দেহ বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ষিত হয়। এইদিন পাঁচ মিনিট কর্মবিরতি পালন করে লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় রাশিয়া সহ অনেক দেশের শ্রমজীবী মানুষ। আজও প্রতিদিন দেশ-বিদেশের শত শত মানুষ যান লেনিন স্মৃতিসৌধে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

লেনিনের জন্ম স্বৈরাচারী জার শাষিত হতশ্রী রাশিয়ায়, মৃত্যু সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর সোভিয়েত ইউনিয়নে। এমন মৌলিক পরিবর্তনের প্রধান রূপকার লেনিন। ৫৪ বছরের সংগ্রামী জীবন, বিপ্লবী জীবন। মেধাবী ছাত্র, কৃতী ছাত্র। খুবই পড়ুয়া। প্রথাগত শিক্ষার পাঠ্যবই, তা ছাড়া নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহিত্য। মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন দাদা আলেক্সান্দার উলিয়ানভের মাধ্যমে। জার তৃতীয় আলেক্সজান্দারকে হত্যার চক্রান্তের অভিযোগে আলেক্সজান্দার উলিয়ানাভ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রাণ দেন ১৮৮৭ সালে। লেনিন দাদাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হন। সেই সময়েই লেনিন মার্কসবাদ যতটুকু আয়ত্ব করেছিলেন, তার থেকেই মনে করেছিলেন দাদার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু পথ ভুল। দাদার ফাঁসি হয় মে মাসে আর বেদনাহত চিত্তেও পরীক্ষায় ভাল ফল করে লেনিন ভর্তি হন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে, তবে রীতিমতো বাধা অতিক্রম করে। ভর্তি হলেন আগস্ট মাসে, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনে যোগদানের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন ও গ্রেপ্তার হলেন ডিসেম্বর মাসে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের আগে মাঝেমাঝেই লেনিনকে হয় কারাগারে, নয় নির্বাসনে, না হয় আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে, এমনকী রাশিয়ার বাইরে ইউরোপের নানা দেশে। বিপ্লবের পরও তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়, গুলি করে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়। ১৮৮৯ সালে তাঁদের গোটা পরিবারের সঙ্গে লেনিন চলে যান কাজান থেকে সামারা শহরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকেই লেখাপড়া করে ১৮৯১ সালে সেই পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ সালে সারায় প্রথম মার্কসবাদী গ্রুপ স্থাপন করেন। মার্কসবাদের চর্চা তো তিনি আগেই শুরু করেছিলেন। এইবার শুরু করলেন মার্কসবাদ প্রচার ও প্রয়োগের কাজ আমৃত্যু নিরলসভাবে।

লেনিন সর্বদা চাইতেন তাঁদের কথা জনগণের কাছে, বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে, আবার তাদের কথা শুনতে। সেইজন্য যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর মতে, ‘‘সংবাদপত্র শুধু যৌথ প্রচারক এবং যৌথ প্রচারান্দোলনকারীই নয়, যৌথ সংগঠকও বটে। যে দালান গড়ে তোলা হচ্ছে তার চারিদিকে বাঁধা ভারার সঙ্গে এদিক থেকে সংবাদপত্রকে তুলনা করা যায়। এই ভারা কাঠামোর বিভিন্ন অংশের রূপরেখা চিহ্নিত করে দেয়, মিস্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সুরাহা করে দেয়, ফলে তারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিতে পারে এবং সংগঠিত শ্রমের সাধারণ ফল প্রত্যক্ষ করতে পারে।’’ (কী করতে হবে) ১৯০০ সালে ‘ইস্কা’ নামে সংবাদপত্র জার্মানিতে ছাপিয়ে গোপনে রাশিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করেন লেনিন। ‘প্রলেতারি’, ‘ভোলনা’, ‘ভপেরিয়দ’, ‘জভেজদা’, ‘ইজভেস্তিয়া’ ইত্যাদি নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত ‘দৈনিক প্রাভদা’ প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। পত্রিকার উপর বারে বারে হামলা হয়, সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন নামে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

লক্ষ্য শ্রেণি শোষণের অবসান, লক্ষ্য শোষণহীন সমাজ, লক্ষ্য শোষণহীন শ্রেণিহীন সমাজ। পুঁজিবাদকে ভেঙ্গে সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের উত্তরণে সাম্যবাদ (কমিউনিজম)। এটা দীর্ঘস্থায়ী ক্রমপর্যায়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর সংগ্রাম, এটা একটা বিরতিহীন বিপ্লবী সংগ্রাম। এই সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য বিপ্লবী তত্ত্ব। বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলেই হবে না। অপরিহার্য বিপ্লবী সংগঠন। তাই মার্কসবাদ, তাই কমিউনিস্ট পার্টি। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী রণনীতি ও রণকৌশল। লেনিনের ভাষায়—‘‘আমাদের মতবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগ্‌দর্শন (১৪৪)—সর্বদাই এই কথা বলতেন মার্কস ও এঙ্গেলস, ‘সূত্র’ মুখস্থ ও তার মামুলী পুনরাবৃত্তিকে সঙ্গত কারণেই বিদ্রুপ করতেন; সর্বোত্তম ক্ষেত্রে সে সূত্রে কেবল সাধারণ কর্তব্য নির্দেশ সম্ভব, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি বিশেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে কর্তব্যের প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটে। (রণকৌশল প্রসঙ্গে পত্রাবলী)

লেনিনের সময়েই পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ হয়, রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। লেনিন এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণ করেন এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের কর্তব্য স্থির করেন। রাশিয়ায় একটা শক্তপোক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। পার্টিটার নাম—রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (১৮৯৮)→রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক) (১৯২২)→রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) (১৯১৮)→ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) (১৯২৫)→ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৫২)। লেনিনের

—এরপর চারের পাতায়

‘মাস-হিস্টিরিয়া’

গীষ্পতি চক্রবর্তী

ভূতের ভয় আছে আপনার? ভূতে পেতে দেখেছেন কাউকে? এ প্রশ্ন এই যুগে কাউকে করলে অনেকে হাসবেন। আপনাকে শুনতে হবে—কি যা তা বলছেন? অথচ একটা সময় ছিল যখন ভূতের কথা উঠলে মা-ঠাকুমারা বলতেন—ভর সন্ধ্যেয় তেনাদের নাম মুখে আনতে নেই। বুকে থুতু দে! ঠাকুর, ঠাকুর! সে-যুগ হয়তো চলে গেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির দৌলতে এইসব বিষয় মনোবিকারের পর্যায়ে সজ্ঞায়িত হয়েছে। বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ মানুষকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে। সহজে মানুষ ভূতের খপ্পরে পড়ে না আর।

তবে ‘মাস হিস্টিরিয়া’ বা একইসঙ্গে বহু মানুষের মধ্যে মিথ্যা ভয়, কাল্পনিক ঘটনা, এমনকি বাস্তবিক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে অহেতুক মাত্রাতিরিক্ত আতঙ্ক ও তার থেকে উদ্ভূত নানা মানসিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। এই গণ-মানসিক ব্যাধি শুধুমাত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্যা নয়; সামাজিক নানা বিষয়ের সঙ্গে, এমনকি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে এর এক জটিল সম্পর্ক আছে। এছাড়া ধর্মীয় ভাবনাকে কেন্দ্র করে ‘মাস হিস্টিরিয়া’ খুব বিরল ঘটনা নয়।

আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে চারিদিকে তাকালে এমন মনে হয়। এদেশের, বিশেষত এরাজ্যে এমন কি ‘মাস হিস্টিরিয়া’-র মতো রোগের দাপটে আমরা কাবু হয়ে পড়েছি।

বহু যুগ ধরে এদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ভাষার মানুষ বাস করে এসেছে শান্তিপূর্ণভাবে। কখনও কখনও কিছু স্থানিক অশান্তির খবর ছাড়া, ও দেশ-বিভাগজনিত দুঃসময়কে বাদ দিলে, মানুষ মানুষের সঙ্গে বাস করেছে সহজ-সম্পর্কে। অথচ এখন এক অসহিষ্ণুতার বিষ যেন গ্রাস করছে গোটা সমাজকে। রাস্তায়-ঘাটে, টেলিভিশনের পর্দায় অনায়াসে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে, ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভাষার মানুষকে আক্রমণ করছে কিছু মানুষ। বাংলা শুধু বাঙালির, বিহার শুধু বিহারীর, আসাম শুধু অসমিয়াদের, এমন কথা বলতে কেউ লজ্জাবোধ করছে না। আসামে এক সময়ে বাঙ্গাল-খেদা আন্দোলন বহু মানুষের জীবনকে তছনছ করেছে। ইন্দিরা-হত্যার পর শিখ মাত্রই নিধনযোগ্য এমন ধারণা অনায়াসে গ্রাস করেছিল তথাকথিত সংখ্যাগুরু মানুষের মন। গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধনের প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি বহু শিক্ষিত মানুষকে। গুজরাট দাঙ্গার কথা উঠলেই অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া পেয়েছি—কেন, গোধরা? কিছু সমাজবিরোধীর হীন কাজের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এক নির্দিষ্ট ধর্ম পরিচয়ের মানুষের ওপর। পাশের দেশ শ্রীলঙ্কায় শুধু তামিল পরিচয়ের কারণে, সংখ্যাগুরু সিংহলীদের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে হিন্দু তালিমদের। তামিলদের ধর্মীয় পরিচয়, জাতিগত পরিচয় তাদেরকে সিংহলীদের শত্রুতে পর্যবসিত করেছে। এই দ্বীপ-রাষ্ট্র এখনও ওই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর মায়ানমারের সেনাদের অত্যাচারের কারণ মূলত তাদের ভিন্ন ধর্ম পরিচয়।

অথচ একসময়ে এইসব মানুষেরা যুগযুগ বাস করে এসেছে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে এক অস্বস্তিকর অনভিপ্রেত আলোচনা শুরু হলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের কথা বলে এদেশের হিন্দু-জাগরণের প্রবক্তারা। তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না, কোনো দেশে সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হলে, তার দায় এদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর বর্তায় না। প্রবল বিক্রমে তারা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় নানা অবাস্তব প্রতিরোধ, প্রতিশোধের তত্ত্ব হাজির করে সবার সামনে। তারা এই সহজ সত্যটা ভুলে যায়, পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতির মানুষ মিলেমিশেই বাস করছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশের হিন্দুদের কথা বলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা চলছে। অথচ নিজের দেশে আসামে, মেঘালয়ে বাঙালিদের ওপর বৈষম্যের যে অন্ধকার নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে, সে সম্পর্কে তারা নীরব। বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরা বলেন—ওদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা জান না তোমরা। যেন, ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা খুব সুখে আছে ওদেশে। দরিদ্র মানুষ, সে যে ধর্মেরই হোক, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকুক, সুখে নেই। প্রতিদিনের এক অনিশ্চিত লড়াই তার জন্য অপেক্ষা করে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের কোনো ফারাক নেই তার কাছে। রাত-দিন তার কাজ। অনিশ্চিত কালকের জন্য আজকের লড়াই তার একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ। কাল সে টিকবে কিনা, তা ঠিক হয় আজকের লড়াইয়ে।

স্পষ্ট, প্রতিদিনের বাস্তবতার প্রতি এক আশ্চর্য অবহেলা চোখে পড়ছে। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই অবহেলা যেন বড় বেশি স্পষ্ট। কোনো এক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংজ্ঞায়িত করে, সেই ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে শুরু করে, আঞ্চলিকতার, প্রাদেশিকতার ও আরও নানা ধরনের বিভেদের আবর্তে তৈরি করা হচ্ছে আতঙ্ক। কিছু মানুষ কি প্রভাবিত হচ্ছে না? কোনো উচ্চশিক্ষিত, সমাজে গণ্যমান্য বলে পরিচিত কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয়-গোষ্ঠী সম্পর্কে ভয় ছড়াতে থাকে, তখন অনেকেরই মনে হয়—এইসব উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা কি না বুঝেই বলছে?

আসলে ‘মাস হিস্টিরিয়া’ এভাবেই গড়ে ওঠে জন-মানসে। রাস্তাঘাটে, বাজারে, দোকানে কিছু মানুষের কল্পিত ভয়ের প্রকাশ, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি, অসহিষ্ণুতা, কারো কথা শুনবো না গোছের দেহের ভাষা বারে বারে ‘মাস হিস্টিরিয়া’র কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই হিস্টিরিয়া, একদিনে গড়ে ওঠেনি। একে গড়ে তোলা হয়েছে। এই ভয়ের বিস্তারের বাস্তব অবস্থা ছিল সমাজের গভীরে। সুস্থ সংস্কৃতির, প্রতিবাদী সংস্কৃতির, প্রগতিশীল সংস্কৃতির ভাষা যেন পথ হারিয়েছে। এক সময়ে একাঙ্ক নাটকের রমরমা ছিল এ রাজ্যে। নানা সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাকে অনায়াসে সকলের মাঝে তুলে ধরত এই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা। কোনে অর্থের টানে নয়, প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে নয়, স্রেফ আদর্শ ও ভালোলাগার তাগিদে সংস্কৃতি জগতে নিজেদের মন-প্রাণ ঢেলে দিত বহু মানুষ। একসময়ে সোচ্চারে সমালোচনাও হতো নানা সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে। সমাজের সর্বত্র, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের গান, সুর কবিতা, ছবি প্রকাশিত হত নির্দ্বিধায়। অথচ কি কারণে বলা মুশকিল, জাতীয়তাবাদের নামে চোরা আক্রমণ নেমে এল প্রগতিশীল সংস্কৃতির ওপর। ধর্মীয় মেরুকরণ সোচ্চারে ঘোষণা করে চলছে সাংস্কৃতিক বিভাজনের বার্তা। ধর্মীয় আচারে, ব্যবহারে, গানে কবিতায় কোনো এক অদৃশ্য অথচ ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে রণদামামা বেজে চলেছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এক কথা—এবার নাশ হবে শত্রুর, এবার ধ্বংস হবে আমাদের ধর্মের, সংস্কৃতির দুশমনরা; আর সহ্য হয় না; এবার সবাই নামো শত্রু বিনাশে। প্রতিষ্ঠা করো স্বর্গরাজ্য। সেই সুদিন দূরে নয়, ইত্যাদি। আসলে এভাবে কানের কাছে বারেবারে সোচ্চারে ঘোষিত নানা বাণী কমন ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে মনের গভীরে তা শ্রোতা জানে না। হঠাৎ প্রতিরোধের রাস্তা খোঁজে অসহায়ভাবে। আত্মসমর্পণ করে কোনো এক তথাকথিত শক্তিশালী, বড়ো আশ্রয়ে। সে আশ্রয়কে সে চোখ বুজে মেনে নেয় কল্পিত নিরাপত্তার আশায়। যে ভয় তার কোনোদিন ছিল না, সেই ভয় তাকে গ্রাস করে। যুক্তির পথ হারিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় কোনো এক অন্ধবিশ্বাসের চোরাগলিতে। এইসব মানুষদের হাতে বিভাজনের অস্ত্র যুগিয়ে যারা সমাজের মধ্যে আগুন জ্বালাতে চাইছে, তারা হয়তো বোঝে না এই আগুন কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বিভাজনের আগুন যথেষ্ট বাতাস পেলে ধর্মীয় বিভাজনের সীমাকে অতিক্রম করে, জাত-পাত, আঞ্চলিকতা-প্রাদেশিকতা, ভাষা, পুরুষ-নারী ইত্যাদি সমস্ত বিভাজনের রেখাকে তার দহনের কুণ্ডে টেনে আনবে। সে আগুন নেভানো কঠিন।

এসবের বিপরীতে থাকে অগ্নিনির্বাপকরা, অথবা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, বলতে হয়, আগুন লাগাতে যারা দেবেন না, তাদের অগ্রগামী বাহিনী সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান কর্মীরা। চারিয়ে দেওয়া ভয়ের ‘মাস হিস্টিরিয়া’-র বিপরীতে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত ঋত্বিক-সত্যজিৎ-মৃণাল, বিভূতিভূষণ-মানিক-সুনীল, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ-রুদ্রপ্রসাদের মতো আরও অনেক নামকরা যায়, যারা দিনের পর দিন মানুষের মধ্যে অতীত থেকে বর্তমানে কাজ করে গেছেন। তাদের অসামান্য সৃষ্টি-সম্পদ আমরা কি ধ্বংস হতে দেব কিছু অর্বাচীনের হাতে? যে পথে হেঁটেছেন সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, জগদীশ বোস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো মানুষেরা, সেই পথ কলুষিত হচ্ছে বিজ্ঞান-বিরোধী উচ্চকিত ভাষণে। গরুর দুধের চেয়ে গো-মূত্র যখন আলোচনায় উঠে আসে এবং তাতে সায় দেয় বেশ কিছু তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত মানুষ, তখন বলতেই হয়, ‘মাস হিস্টিরিয়া’য় আক্রান্ত আমাদের মস্তিষ্ক। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, সুস্থ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, এই ঔদ্ধত্য আমরা যদি মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে এ বাংলায়, বাঙালির, এদেশের মানুষের চেতনার মৃত্যু হয়েছে।

আসলে ‘মাস হিস্টিরিয়া’র শক্তি কিছু কম নয়। আমরা একে খাটো করে দেখেছি। এখন তা নিজের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা চাইছে সমাজে। এ এক বিষম নেশা। প্রথমে ধীরে, তারপর শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে তা গায়ের জোরে সোচ্চারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে জন-মানসে। তখন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীকে স্বাভাবিক মনে হয়। স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ হয়ে ওঠে প্রান্তিক, সে বেঁচে থাকে ‘মাস হিস্টিরিয়া’গ্রস্ত মানুষের দয়ায়। জার্মানিতে ইহুদি বিদ্বেষ,, আমেরিকায় ম্যাকার্থীবাদ, আফগানিস্তানে তালিবানি অসহিষ্ণুতার ভয়াবহ পরিণতি, ইত্যাদি আরও অনেক ঘটনা ‘মাস হিস্টিরিয়া’ ছাড়া আর কিছু নয়। এসবের পেছনে আর্থ-সামাজিক নানা জটিল প্রক্রিয়া কার্যকর হতে পারে, সবশেষে তার প্রকাশ মানসিক বিকারের এক যৌথ পরিণতি—‘মাস হিস্টিরিয়া’য়। এই অসুস্থ, অশুভ শক্তি যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তার পরিণতি কি হতে পারে তার প্রমাণ হাজার বছরের রাইখের স্বপ্ন বারো বছরে শেষ জার্মানীর পূর্ণ ধ্বংসে—রাষ্ট্রযন্ত্র রাজনৈতিক দল, পুরো প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সমেত। পাশের দেশ আফগানিস্তানে তালিবান প্রায় ধ্বংস করে এনেছে সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে-বিদেশে’-র আফগান

—এরপর চারের পাতায়

প্রান্তজন—আত্মজন (২)

রত্না রশীদ

চোখ মেলতে দেখলাম হসপিট্যালের বেডে শুয়ে আছি। মায়ের মুখ ঝুঁকে আছে আমার মুখে, টপটপ করে জল গড়াচ্ছে অবিরল।

বাড়ি ফিরে দেখলাম ঘর-বাড়ি জিনিসপত্তর ছত্রাকার—আমার ছোট ছোট ভাইগুলো শুকনো মুখে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমার মামিমা এলো (মামাও রেল চাকুরে) ঘর সংসার গুছিয়ে দিতে, রান্নাবান্না করে দিতে। বাপি কোথায় আমরা কেউ জানি না—ভাগ্যে এখানে ছিলো না! আজ মনে হলো বাপিকে ছেড়ে থাকাটাই ভালো।

সহদেবকাকুকে পুলিশ এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। কান্নাকাটি পড়ে গেছে পাড়াতে। সহদেব কাকীমা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। বাড়িতে তালা। পাড়া জুড়ে কেমন একটা ছমছমে আতঙ্কের ভাব। ছোটদের ছেলেমানুষী খেলাধূলো বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু প্রায়ই ঘনঘন বাপির সহকর্মীরা ও সহযাত্রীরা এসে আমাদের খোঁজ খবর করে যেতেন।

এমনই একদিন বিনয় জ্যেঠু (চৌধুরী) এলেন আমাদের খোঁজ খবর করতে। মাকে আশ্বাস দিলেন—চিন্তা কোরো না বৌমা, আমরা রয়েছি। বাপি এখানে থাকতে উনি প্রায়ই আসতেন, অন্য ঘরে বসে অনেকক্ষণ কীসব আলোচনা করতেন। আমাদের মনেই হতো না যে উনি কোনো বাইরের লোক এসেছেন। মাঝে মাঝে কোলে নিতেন আমাদের। আজ ওঁকে দেখে আমরা সবাই পরম আশ্বাসে ওঁর হাঁটু চেপে ধরলাম। আমি তো ভ্যাঁ। উনি আমাকে বললেন, ...ওরে তুই কাঁদছিস কেন, তুই তো আমার হাজারে এক সাহসী মেয়ে। তুই সেদিন প্রতিবাদ করলি বলে পুলিশ আর কোয়ার্টারে ঢুকতে পারেনি রে... তোর চোখে জল মানায় না। আমি তখন এতোই ছোট যে জ্যেঠুকে বুঝিয়ে বলতে পারলাম না যে, কষ্টে বা যন্ত্রণায় আমার কান্না পায় না জ্যেঠু, তুমি আদর করলে, তাই।

এর মাসখানেক পর খুদুমা (একজন সাঁওতাল রমনী যার কাছে মা আমাকে খুদ নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল কারণ মায়ের প্রথম সন্তান তিন মাস বয়সে মারা গেছিলো, সন্তানের জন্যে মায়েরা যে কী করেন তার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না) সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আমাদের বাড়িতে এসে মাথা থেকে শুশুনি শাকের বেতের ঝুড়িটা নামালো। আশপাশ থেকে অন্য কাকিমারাও ছুটে এলো শাক কিনবার জন্য। তখন পাঁচ পয়সায় অনেক অনেক শাক। মা কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, মাকে আর কিছুতেই শাক দিচ্ছে না। সব কাকিমারা শাক নিয়ে চলে যাবার পর খুদুমা মাকে বললো—যাও দিদি, একটা হাঁড়ি নিয়ে এসো, আমি মাটিতে শাক ফেলবো না।

মা কী বুঝলো কে জানে, সত্যি সত্যি হাঁড়ি নিয়ে এলো। খুদুমা কেমন কায়দা করে শাকগুলো হাঁড়িতে দিলো, যে ওপরেরগুলো ওপরেই থাকলো আর নীচেরগুলো নীচে। এবার খুদুমা বললো, ...শাকগুলো আগে বাছবে, তারপর ধোবে। আগেই যেন জল ঢেলে দিও না। মা মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেল।

অনেক পরে বড়ো হয়ে জেনেছি, শাকের বোঝার নিচে ছিল আমার মাকে লেখা বাপির সাংকেতিক চিঠি। খুদুমা মাঝে মাঝেই শাক, ডিম, ছাতু বিক্রি করতে এসে মায়ের কাছে বাবার চিঠি পৌঁছে দিতো।

অনেক অনেকদিন আমরা ভাই-বোনেরা বাপির কোনো খবর না পেয়ে ধরে নিয়েছি বাপি হিমালয়ে গিয়ে সাধু হয়ে গেছে। এবার একটা নিম্নবিত্ত সংসারে চাকুরি-সম্বল একমাত্র রোজগারটি টানা চার মাস বন্ধ থাকলে যা হবার কথা তারই চিহ্ন সর্বত্র ফুটে উঠতে লাগলো। আমার ধবধবে সুন্দরী মা শুকিয়ে কালি, ভাইগুলো ধোঁয়া ওঠা হাড়গিলে, ভাত-ডাল-শাক-সব্জি সব একসঙ্গে ফোটানো হয় আর স্রেফ নুন দিয়ে ভোজন। ভাতের ফ্যান ফেলা হতো না। ওই খেয়ে আমরা স্কুলে যেতাম, রাত্রে ফিরে শুধু ফ্যানভাত। আমার মেজো ভাইটার রিকেট ছিলো। মামিমা প্রায় রোজই ওকে কোলে করে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে বাড়তি কিছু খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আমাদের ডাকলেও আমরা যেতাম না, মায়ের কড়া নিষেধ ছিল।

মা একটা একটা করে গয়না বিক্রি করে আমাদের নুন-ভাত নিশ্চিত রাখতো। আর লট্ ধরে রেলওয়ে ইউনিফর্ম তৈরি করতো। সারাদিন বাড়িতে সেলাই মেশিন চলতো—ওই ছিল মায়ের নিজস্ব রোজগার। কিন্তু পেমেন্ট ছিল খুবই অনিয়মিত। মহিলা সমিতি মারফৎ রেলের ইউনিফর্মের মজুরির টাকা হাতে পেলে মা সেই দিনই আমাদের সব ভাইবোনকে গোটা গোটা ডিমের ডালনা রেঁধে খাওয়াতো। আর খেতে বসে বাপির জন্য নতুন করে হু হু কান্নার প্লাবন ডাকতো চোখে, —নুনের ব্যয়সংকোচ।

(ক্রমশঃ)

উপরে মঙ্গলকোট ও নিচে পূর্বস্থলীতে সংযুক্ত মোর্চার প্রচার চলছে।

রক্ত সংকট মোকাবিলায় ছাত্ররা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ এপ্রিল : কালনা মহাকুমা হাসপাতালের চরম রক্ত সংকটে এগিয়ে এল একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। কালনা 'ভিশন এডুকেশন' নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এইদিন রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে ৫০ ইউনিট রক্ত দান করে। নতুন করে করোনা আবহের পরিস্থিতি, চরম গরম এবং সর্বোপরি নির্বাচনের কারণে চিরাচরিত রক্তদান শিবিরগুলি প্রায় বন্ধ। ফলে কালনা মহাকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের ভাঁড়ার একেবারে তলানিতে। এই হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগী এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা চরম সংকটে পড়েছে। সেই সংকটের কথা উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্ররা জানতে পেরে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অবসরপ্রাপ্ত সাব মেজর নরেশচন্দ্র দাস জানান, বর্তমান সময়ে কালনায় চরম রক্ত সংকট চলছে। এই সংকটে আরো বেশি বেশি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে আসা উচিত।

পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীর প্রচার।

কোভিড সতর্কবিধি

কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের ছোবলে বেসামাল দেশ তথা রাজ্য। দৈনিক সংক্রমণ দেশে ২.৬ লক্ষ আর রাজ্যে ৮ হাজার ছাড়িয়েছে। দৈনিক মৃত্যু দেশে ১৫০০ এবং রাজ্যে ৩০-এর বেশি। চিকিৎসার হাহাকার দেশ জুড়ে। সকলে সতর্ক থাকুন। বিশেষ প্রয়োজন হলে তবেই শারীরিক দূরত্ব মেনে, মাস্ক পরে, বাড়ির বাইরে বের হবার আবেদন রাখা হচ্ছে। এই কঠিন সময়ে সকল স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে সহযোগিতা করা একান্তভাবে কাম্য।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৫২ সালে, ২৩৮৩২ জন মনোনীত, ৩১ মার্চ, ১৯৫২, কংগ্রেস, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ১ জুলাই ১৯৬২ সাল। ২. ১৯৬২ সালে, ৩ মার্চ, কংগ্রেস, প্রফুল্লচন্দ্র সেন (১.৭.১৯৬২ থেকে) ২৫২৪৪ জন মনোনীত। ৩. ১৯৬৭ সালের ১ মার্চ, যুক্তফ্রন্টের অজয় মুখার্জী, ২৮০৪৪ জন মনোনীত। ৪. ১৯৭২ সালে, ২০ মার্চ, কংগ্রেস, সিদ্ধার্থশংকর রায়, সিপিআই(এম)। ৫. ১৯৭৭ সালে, ২১ জুন। ২৯৪৪১ জন মনোনীত, বামফ্রন্টের সিপিআই(এম), জ্যোতি বসু, ১৫.০৯.২০০০। ৬. ২০০১ সাল, ১৫ মে, বামফ্রন্টের সিপিআই(এম) দলের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ২০১১ সালে ১৩ মে পর্যন্ত। ৭. ২০১১ সালে, ১৪ মে, তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জী। ৮. ২০১৬ সাল, ২৫ মে। ৯. ২৭ মার্চ হতে ২৯ এপ্রিল ৮ দফায়, ২ মে ২০২১। ১০. ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা ব্যানার্জী। ১১. অজয় মুখার্জী, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১ সালে। ১২. জ্যোতি বসু, ২৪ বছর, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৬ সালে।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ এপ্রিল : সিপিআই(এম) মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটি এলাকার দেনুর ৪ নম্বর শাখার সিপিআই(এম) সদস্য শেখ আব্দুল হামিদের জীবনাবসান হয়েছে। তিনি চিকিৎসারত অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। ৪ দিন আগে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ তাঁর মৃতদেহ মন্তেশ্বরের মৌসা গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে ছুটে যান বহু সিপিআই(এম) নেতা, কর্মী, অনুরাগীরা। পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার, মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী অনুপম ঘোষ, হামিদ শেখ, সৌমেন ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্থানীয় কবরস্থানে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রয়াত শেখ আব্দুল হামিদ সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন।

প্রয়াত বর্ধমানের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : চলে গেলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি ও সৃজন ব্যক্তিত্ব অনিলেন্দু ভট্টাচার্য (৭৭)। তিনি বর্ধমান বাণীপীঠ হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। গত শতকের সাতের দশকে 'নতুন সংস্কৃতি' আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে চালিত এই সংগঠনের সাপ্তাহিক সাহিত্যচর্চার বৈঠকে নবীন লেখকদের লেখা পাঠ ও তা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা হতো। অনিলেন্দুবাবু 'অভিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় বহু মূল্যবান সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তিনি কলকাতার বাগুইআটিতে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে বর্ধমানের লেখক কবি মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান। 'নতুন চিঠি' পবিবার তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে।

মার্কসবাদ থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

—দুয়ের পাতার পর

অনুপস্থিতিতে পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ঢিলেঢালা পার্টি। লেনিনের উদ্যোগে পার্টির কর্মসূচি, পার্টির গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতিতে পার্টি পরিচালনা শুরু হয়। তীব্র তর্ক-বিতর্ক, ভোটাভুটি হয়, শেষ পর্যন্ত পার্টি দু'ভাগ হয়। লেনিনের পার্টি হয় আঁটোসাঁটো 'বলশেভিক' পার্টি। পার্টি কখনও প্রকাশ্যে কাজ করে, কখনও অপ্রকাশ্যে। রাশিয়ার আইনসভায় (ডুমা) কখনও অংশগ্রহণ করে, কখনও করে না। কখনও অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে, কখনও 'চায়ের জন্য গরম জল চাই', দাবিতে আন্দোলন করে। ভুল-ত্রুটি হলে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে তা সংশোধন করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। তাই দাবি তোলা হয় রুটি, জমি, শান্তি, স্বাধীনতা। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে জারের শাসনের অবসান হলো। পার্টিতে বিতর্ক দেখা দিল—'অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন' না 'অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ'। লেনিন আত্মগোপনে ছিলেন সুইজারল্যান্ডে। ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে রাশিয়ায় ফিরে হাজির করলেন তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস'। সিদ্ধান্ত হলো 'সমস্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে', 'অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন নয়'। সোভিয়েত বলতে রাশিয়ার এক-একটা এলাকায় স্থানীয় সৈনিকদের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা। শেষ পর্যন্ত নভেম্বর মাসে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হলো। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রধান লেনিন।

আন্তর্জাতিক নেতা

লেনিন তো মার্কস-এঙ্গেলসের উত্তরসুরী। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা, ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা। তাঁরই উদ্যোগে ১৯১৯ সালে স্থাপিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক। প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪-৭৬), দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (১৮৮৯-১৯১৪)। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৯০ সালে থেকে ১ মে 'শ্রমিক সংহতি দিবস' পালন করা হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সবোলেভ, শিরিনিয়া, ফির্সোভ সংকলিত 'সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক রূপরেখা'য় লেখা হয়েছে, "সমগ্র উৎপীড়িত মানবজাতির মুক্তির জন্যে সংগ্রামের সংগঠন হিসেবে, নৃকুল কিংবা জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমস্ত দেশের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, যাকে একেবারে আরম্ভ থেকেই পরিচালনা করেছিলেন মহান লেনিন"। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও এই আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধিদের হাতে লেনিনের 'বামপন্থী কমিউনিজম —শিশুদের রোগ' বইটা দেওয়া হয়েছিল।

আজকের বিশ্ব

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর নেই। সমাজতান্ত্রিক শিবির বর্তমানে অনুপস্থিত। তাই কেউ কেউ মনে করছেন যে সমাজতন্ত্র বাতিল হয়ে গেছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অচল হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদের তো সুবর্ণ সুযোগ। তাহলে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এই সঙ্কট কেন? ২০০৮ সাল থেকে গভীর সঙ্কট চলছে। আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিরসন হতে পারে না। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বন্দ্বের মীমাংসা হতে পারে না। তাহলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপর্যয় হল কেন? এটা গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। এখনও যে কারণগুলো জানা গেছে, তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে বিকৃতি, সমাজতন্ত্র নির্মাণের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব, অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থায় সময়মতো পরিবর্তন আনতে না পারা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও গভীর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, আমলাতান্ত্রিকতার বৃদ্ধি, বিপ্লবী নৈতিকতার মানের অবনতি, মতাদর্শগত ক্ষেত্রে গুরুতর বিচ্যুতি পার্টি ও রাষ্ট্র থেকে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা। এর ফলে দেশের ভেতরের প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং দেশের বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্মিলিতভাবে সমাজতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করার তৎপরতা চালিয়ে যেতে পেরেছে।

মানুষের ইতিহাস সরল রেখায় এগোয় না, নানা ঘাত-প্রতিঘাত, টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে এগোয়। সমাজ বিকাশের ধারা তাই প্রমাণ করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ, অম্লান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

'মাস-হিস্টিরিয়া'

—তিনের পাতার পর

সভ্যতাকে। ম্যাকার্থীবাদের লজ্জা থেকে আমেরিকা আজও মুক্ত নয়।

যাদের ঘাড়ে ভূত চাপে তারা ভূত দেখতে পায় না। ভূত দেখতে না পেলেও ভূতে পাওয়া রোগী দেখতে ভিড় জমে। সেই ভিড়ের মধ্যে এরপর কাউকে ভূতে পেতে পারে। ভূতের গল্প ছড়িয়ে যায় গাঁ-গঞ্জে। এভাবেই ভূতে পেয়েছে এদেশের কিছু মানুষকে। তারা প্রাণপণে খুঁজে চলেছে শত্রু। ভয়ে হাত-পা খিঁচে তারা প্রমাণ করতে চায়, দ্যাখো ভূত আছে গো, ভূত আছে। সুস্থ মনের মানুষের দায়িত্ব রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই ভূতে পাওয়া রোগীদের চিকিৎসা শুধু ডাক্তারদের কম্মো নয়; বিজ্ঞান-কর্মী, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে ভূত ছাড়ানোর কাজে। ভূতের হাতে তো দেশ, সমাজ ছেড়ে দেওয়া যায় না।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

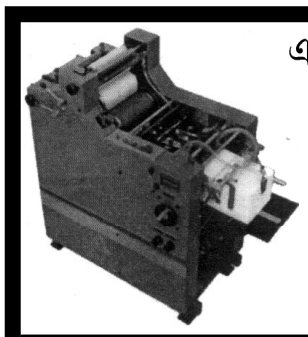

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা